بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)- এর ২৭শে মার্চ, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বীয় আগমনের উদ্দেশ্যকে যে পাঁচটি শাখার সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন সেগুলোর একটি শাখা হলো, ইশতেহার বা বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশ অর্থাৎ তবলীগ এবং সত্য স্পষ্ট করার জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রচার করা।

এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, আজ আমি সত্য সুস্পষ্ট করার জন্য বিরোধী এবং অস্বীকারকারীদের সত্যের প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে চল্লিশটি বিজ্ঞাপন প্রকাশে সংকল্পবদ্ধ হয়েছি যেন কিয়ামত দিবসে আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে এটি প্রমাণ গণ্য হয় যে, যেই উদ্দেশ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি আমি তা বাস্তবায়ন করেছি। আর এটি শুধু কয়েকটি বিজ্ঞাপনই নয় বা শুধু একবার বিজ্ঞাপন দিয়েই ক্ষান্ত হন নি বরং যদি খতিয়ে দেখা হয় তবে দেখা যাবে, নিজ দাবীর সূচনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অগণিত বিজ্ঞাপন তিনি প্রচার করেছেন। এসব বিজ্ঞাপন বা ইশতেহার যা ছাপানো রয়েছে; যদি দেখা হয় তাহলে প্রমাণিত হবে, এগুলো ধর্মজগতের জন্য একটি ধনভান্ডার। মুসলমান, খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরকেও ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর হৃদয়ে এক ব্যাকুলতা ছিল। তিনি একাই এই কাজ করতেন এবং এই উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম করতেন। তাঁর বড় বড় গ্রন্থ তো আছেই। সৃষ্টির প্রতি তাঁর সহানুভূতির চিত্র এবং পৃথিবীবাসীর সংশোধনের জন্য তাঁর ব্যাথাতুর হৃদয়ের চিত্র ছোট ছোট বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেও ফুটে উঠে। আর জগদ্বাসীর সংশোধনের জন্য হৃদয়ে ব্যাথা লালন এবং তা অব্যাহত রাখা তাঁর জামাতের সভ্য বা সদস্যদেরও দায়িত্ব। তাই এদিকে স্থায়ীভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ের এই ব্যাথা এবং এজন্য তাঁর অসাধারণ পরিশ্রম সম্পর্কে এক জায়গায় বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি দিবা-রাত্র কাজে রত থাকতেন এবং বিজ্ঞাপনের পর বিজ্ঞাপন প্রচার করতেন। মানুষ তাঁর কাজ দেখে বিস্মিত হতো। একটি বিজ্ঞাপন প্রচারের জের কাটার পূর্বেই এবং এরফলে সৃষ্ট বিরোধিতার অগ্নি যেভাবে জ্বলে উঠত তার রেশ কাটার পূর্বেই তিনি দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিতেন। এমনকি কেউ কেউ বলত, এমন সময় কোন বিজ্ঞাপন দেয়া মানুষের মন-মস্তিস্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিন্তু তিনি এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন না এবং বলতেন, গরম লোহাতেই আঘাত করতে হয়। আর উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হওয়া শুরু হলেই তাৎক্ষণিকভাবে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিতেন যার ফলে পুনরায় বিরোধিতার হৈ-চৈ আরম্ভ হয়ে

যেতো। তিনি এভাবেই অহর্নিশি কাজ করেছেন আর এটিই সফলতা লাভের মাধ্যম। আমরাও যদি এই পদ্ধতি অবলম্বন করি তাহলে সফল হতে পারি। এ কথা ভাবা উচিত নয় যে, বিরোধিতা স্তিমিত হোক। বিরোধিতার পাশাপাশি যদি বিজ্ঞাপনও প্রচার হতে থাকে তবেই মানুষের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

পুনরায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরই যুগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে ইশতেহার বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তবলীগ হত। সেসব বিজ্ঞাপন দু'চার পৃষ্ঠা সম্বলিত হত এবং এর মাধ্যমে দেশে হৈ-চৈ সৃষ্টি করে দেয়া হত। ব্যাপক সংখ্যায় সেগুলো প্রচার করা হত। সেই যুগের নিরিখে অজস্র বলতে এক-দু'হাজার বুঝায়। অনেক সময় দশ-দশ হাজার সংখ্যায়ও বিজ্ঞাপন প্রচার করা হত কিন্তু এখন আমাদের জামাত পূর্বের চেয়ে বহু গুণ বেশি বা বড়। এখন বিজ্ঞাপনের প্রচার পঞ্চাশ হাজার বা লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় করা উচিত। এরপর দেখ! বিজ্ঞাপন কীভাবে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। পূর্বে বছরে যদি ১২বার বিজ্ঞাপন ছাপানো হত আর এখন বছরে দু'তিন বারও ছাপানো হয়, পৃষ্ঠার সংখ্যা দু'চারেও নামিয়ে আনা হয় কিন্তু তা যদি লক্ষ বা দু'লক্ষ সংখ্যায় ছাপা হয় তাহলে বুঝা যাবে, তা কীভাবে গতি সঞ্চার করতে সক্ষম।

তিন-চার বছর পূর্বে আমি জামাতগুলোকে বলেছিলাম, এক বা দুই পৃষ্ঠা সম্বলিত তবলীগি লিফলেট প্রচার করুন। আর আমি টার্গেট দিয়েছিলাম, লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় এটি প্রচার করা উচিত। যার মাধ্যমে পৃথিবী ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হবে। পৃথিবী যেন বুঝতে পারে, ইসলামের বাস্তবতা কী। পৃথিবী যেন এই বার্তা পায়, এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করে পুনরায় ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন এবং প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর পৃথিবীবাসী যেন বুঝতে পারে, এখনও আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বান্দাদেরকে শয়তানের থাবা থেকে রক্ষা করার জন্য নিজের মনোনীত ব্যক্তিবর্গকে প্রেরণ করেন। যাহোক, যে সমস্ত জামাত এ ক্ষেত্রে কাজ করেছে সেখানে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় খুবই ইতিবাচক ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে। স্পেনে জামেয়ার ছাত্রদেরকে আমি পাঠিয়েছিলাম। তারা সেখানে অনেক বড় কাজ করেছে। বিভিন্ন ধরনের প্রায় তিন লক্ষ প্যাম্ফলেট তারা বিতরণ করেছে। অনুরূপভাবে কানাডার জামেয়ার ছাত্ররা স্পেনিস ভাষাভাষী দেশগুলোতে এবং মেক্সিকো গিয়ে বিজ্ঞাপন বিতরণ করেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এরফলে তবলীগের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়েছে এবং বয়আতও হয়েছে।

অতএব এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বড় বড় বই পুস্তক বিতরণের পরিবর্তে উপর্যুপরি দুই পৃষ্ঠা সম্বলিত প্যাম্ফলেট ছাপানো এবং বিতরণ করা উচিত।

বিজ্ঞাপন কেমন হওয়া উচিত, এ সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কথা প্রসঙ্গে এও বলেছেন, অনেকে নিজেরাই বিজ্ঞাপন প্রচার করতে চায়। সে যুগেও এই মনমানসিকতা ছিল। এখন হুবহু পূর্বের মত করতে না পারলেও ব্যক্তিগতভাবে কিছু না কিছু করতে চায়। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন, কেন্দ্র

থেকে যে সমস্ত বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় সেগুলোই বিতরণ করা উচিত আর এগুলোরই প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। নিজে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে গেলে অনেক সময় আত্মশ্লাঘাও হৃদয়ে দানা বাঁধে যে, এতে আমার নাম হবে। আর এটি এমন এক কঠিন ব্যাধি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে একটি কাহিনী শোনাতেন। অর্থাৎ আত্মশ্লাঘা বা আত্মম্ভরিতা বা অনেকের আত্মপ্রচারের আগ্রহ থেকে থাকে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি কাহিনী বর্ণনা করতেন যে, এক মহিলা ছিল যে একটি আর্থটি বানিয়েছিল। কিন্তু কোন মহিলা সেই আর্থটির প্রশংসা করেনি। এক দিন সেই মহিলা নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় আর যখন সকল মানুষ সমবেত হয় তখন সে বলে, কেবল এই আর্থটিটি-ই রক্ষা পেয়েছে, আর কিছুই রক্ষা পায়নি। তখন কেউ একজন জিজ্ঞেস করে, এটি কবে বানিয়েছ? সে বলে, কেউ যদি পূর্বেই এ কথা জিজ্ঞেস করতো তাহলে আজ আমার ঘর জ্বলতো না। এক কথায় খ্যাতি লাভের ব্যাধি এমন এক ব্যাধি, যে এতে আক্রান্ত হয় তা তাকে ঘুনের মত খেয়ে ফেলে আর এমন মানুষ বুঝতেই পারে না। এটি শুধু বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেই নয় বরং অন্যান্য ক্ষেত্রেও আত্মশ্লাঘা এবং খ্যাতি অর্জনের পোকা যখন মাথায় ঢুকে যায় আর মানুষ তা অর্জনের জন্য অপচেষ্টা করে তখন এরফলে লাভের পরিবর্তে ক্ষতিই বেশি হয়। এখন তো আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তবলীগের ক্ষেত্রে এত ব্যাপকতা এসে গেছে যে, কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার করে তাহলে তা যৎসামান্যই হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের গন্ডিতে আত্মপ্রচারের পিপাসা কিছুটা নিবারণ হয়। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি সঠিক হয়ে থাকে, এমন নয় যে, সবাই আত্মশ্লাঘার বশবর্তী হয়েই এমনটি করে। অনেকেই সুস্থ এবং নেক মনমানসিকতা নিয়েও করে থাকে। কাজেই যেখানে মানুষ নিজের থেকে বিজ্ঞাপন প্রচার করছে তাদের মতে এটি যদি ভালো জিনিস হয়ে থাকে তাহলে একে আরো ব্যাপকভাবে এবং ব্যাপক পরিসরে করা উচিত। কেননা কারো মাথায় যদি কোন কল্যাণকর ধারনা স্থান পায় যারফলে বিজ্ঞাপন উৎকৃষ্টভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়, আর আকর্ষণীয় হয় এবং মানুষের দৃষ্টিও যদি আকর্ষণ করে অধিকন্তু তাতে বিধৃত বিষয়ও যদি উন্নতমানের হয়ে থাকে তাহলে তা জামাতের ব্যবস্থাপনার হাতে তুলে দেয়া উচিত। এটি যদি এমন মানের হয়ে থাকে তাহলে জামাতের ব্যবস্থাপনা-ই তা ছাপার ব্যবস্থা করবে।

এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবা সংক্রান্ত হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কিছু রেফারেন্সেস বা উদ্ধৃতি তুলে ধরব যা বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে। এক জায়গায় তিনি বলেন, আফগানিস্তানের শহীদদের ওপর যখন পাথর বর্ষিত হতো তখন তারা ভয় পেতেন না বরং অবিচলতা এবং বীরত্বের সাথে তা মাথা পেতে নিতেন। আর যখন অনেক বেশি পাথর বর্ষিত হতে থাকে তখন সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ শহীদ, নিয়ামতুল্লাহ্ খান সাহেব এবং অন্যান্য শহীদরা এ কথাই বলেছেন, হে আল্লাহ্! এদের প্রতি করুণা কর এবং তাদেরকে হিদায়াত দাও। আসল কথা হলো, মানুষের ভেতর যদি প্রেমের প্রেরণা থাকে তাহলে তার-রীতি নীতিই বদলে যায়। তার কথায় প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি সৃষ্টি হয় আর তার চেহারার জ্যোতির্মন্ডিত কিরণ মানুষকে আকর্ষণ করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে এখানে অর্থাৎ কাদিয়ানে সহস্র-সহস্র মানুষ এসেছেন। আর তারা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ

(আ.)-কে দেখেছেন আর এ কথাই বলেছেন, এটি মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না। তাঁর (আ.) মুখ থেকে তারা একটি শব্দও শুনেন নি কিন্তু বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। এমন দৃষ্টান্ত আজও আমাদের চোখে পড়ে। আমার কাছে অনেক চিঠিপত্র আসে যাতে উল্লেখ থাকে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখেই বলতে বাধ্য হয়েছি, এটি মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না আর আমরা বয়আত করেছি।

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, আমাদের জামাতে তিন ধরনের মানুষ রয়েছে। তিনি বলেন, আমি বেশ কয়েকবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে একথা বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, আমাদের জামাতে তিন ধরনের মানুষ রয়েছে। প্রথমতঃ তারা যারা আমার দাবী বুঝে-শুনে এবং চিন্তাভাবনা করে আহমদী হয়েছে। সেযুগে ইসলামের অবস্থা ছিল বড় শোচনীয় ছিল এবং মুসলমানদের ঐক্য সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গিয়েছিল। তাই মানুষের স্বভাব এবং প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন আসে আর এই বিভিন্ন প্রকৃতি এবং স্বভাবের মানুষ যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবী এবং জামাত গঠিত হতে দেখে তখন তারা গ্রহণ করে। হযরত মসীহ্ (আ.) সেসব লোকদের অবস্থা বর্ণনা করছেন যে, এরা তিন ধরনের মানুষ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, প্রথম শ্রেণী হলো, তারা যারা আমার দাবীকে বুঝে-শুনে এবং চিন্তা ভাবনা করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। তারা আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানে এবং বুঝে। আর তারা এটিও বুঝে, যেভাবে পূর্বের নবীদের জামাত ত্যাগ স্বীকার করেছে একইভাবে আমাদেরও ত্যাগ স্বীকার করা উচিত। কিন্তু আরেকটি শ্রেণী এমনও আছে যারা কেবল হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের কারণে আমাদের জামাতভুক্ত হয়েছে। তারা আমার আগমনের উদ্দেশ্য কি তা জানে না কিন্তু তারা শুধু এই কারণে জামাতভুক্ত হয়েছে যে, হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, তিনি তাদের শিক্ষক ছিলেন। তারা তাকে সম্মানিত এবং বুদ্ধিমান মনে করত। তারা বলল, মৌলভী সাহেব যেহেতু আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন তাই চলো আমরাও আহমদী হয়ে যাই। তাই আমাদের জামাতের সাথে তাদের সম্পর্ক কেবল হযরত মৌলভী সাহেবের কল্যাণে বা সুবাদে। জামাতের উদ্দেশ্য এবং আমার প্রেরিত হওয়ার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কী তা তারা বুঝে নি। এছাড়া যুবকদের সমন্বয়ে একটি তৃতীয় শ্রেণীও রয়েছে যাদের হৃদয়ে যদিও মুসলমানদের ব্যাথা এবং বেদনা ছিল, কিন্তু সেটি ছিল জাতিগত ভাবে, ধর্মীয় ভাবে নয়। তারা চাইত, মুসলমানদের একটি দল বা গোষ্ঠি থাকা চাই। অর্থাৎ ধর্মীয়ভাবে কোন ব্যাথা বেদনা ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা দেখে তারা চাইত, তাদেরও একটি জাতি সত্তা বা একটি দল থাকা চাই। তাই এমন মানুষও জামাতভুক্ত হয়েছে। এরপর তারা যখন দেখলো, ধর্মের ওপর বেশি জোর দেয়া হচ্ছে তখন তাদের অনেকেই পৃথক হয়ে যায়। দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে বিভিন্ন সময় তাদের অনেকেই পৃথক হয়ে যায়। আজকালও মুসলমান যুবকদের মাঝে যে উদ্দীপনা দেখা যায়, যাদের অনেকেই গিয়ে অন্যায়ভাবে কোন সন্ত্রাসী সংগঠনে যোগ দেয় তারা শুধু এটিই মনে করে, জাতিগতভাবে আমাদেরও একটি দল থাকা চাই বা এমন একটি গোষ্ঠি থাকা চাই যার মাধ্যমে মুসলমানদের

জাতিসত্তার চেতনাবোধ জাগ্রত হবে অথচ ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে এরা কিছুই জানে না। ইরাক ও সিরিয়া থেকে যে কিছু রিপোর্ট আসে তাথেকে এটিই জানা যায়, তাদের অনেক কাজ এমন যা কুরআন ও হাদীস সম্মত নয়। যখন সেগুলো সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, তারা একথাই বলে, আমরা এতকিছু বুঝিনা। আমাদেরকে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে। আমাদের যে এক স্বাতন্ত্র্যতা গড়ে উঠছে তা ইসলামের নামে আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কাজেই এমন লোকও রয়েছে। যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ) বলছেন, তারা জাতিগত ঐক্য চায়, সাংগঠনিক শক্তি গড়তে চায়, সংগঠন গড়তে চায়, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় অর্থাৎ জাতিগতভাবে এসব কাজ করতে চায়। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের কোন দল গড়ে তোলা যেহেতু তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল তাই তারা আমাদের জামাতে যোগ দিল। আর এখন তারা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে চায় আর চায় মানুষ সেখান থেকে ডিগ্রি অর্জন করবে। আর এ কারণেই তারা আমাদের জামাতকে শুধুমাত্র একটি সংগঠন বলে মনে করে, ধর্ম মনে করে না। যেসব বিষয়কে জাগতিক উন্নতির কারণ মনে করা হয় সেগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন আর ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতির মাধ্যম সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ও পৃথক। জাগতিক সংগঠনগুলো ভিন্নভাবে উন্নতি করে আর ধর্ম অন্যভাবে। ধর্মের উন্নতির জন্য আবশ্যক হলো চারিত্রিক সংশোধন, উন্নত আখলাক, ত্যাগ এবং কুরবানীর বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক, নামায পড়া আবশ্যক যেন আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়, রোযা রাখা আবশ্যক, আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা বা তাওয়াক্কুলের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক, তাঁর আনুগত্য এবং এতায়াতের অঙ্গীকার করা আবশ্যক। যদি আমরা এসব কাজ করি তাহলে পৃথিবীর দৃষ্টিতে হয়তো আমরা উন্মাদ আখ্যায়িত হবো কিন্তু খোদা তা'লার পবিত্র দৃষ্টিতে আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান আর কেউ হবে না। কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মুসলমানরা যখন আর্থিক কুরবানী করে তখন মুনাফিকরা বলে, মুসলমানরা হচ্ছে আহাম্মক বা নির্বোধ। অনর্থক টাকা নষ্ট করে চলেছে। নিজেদের টাকা সঠিক কাজে ব্যবহার করার মত কান্ডজ্ঞানও তাদের নেই। অনুরূপভাবে মুসলমানরা যখন সময়ের কুরবানী করে তখন এরা বলে, তারা তো পাগল। অনর্থক নিজেদের সময় নষ্ট করছে, এদের উন্নতি সুদূর পরাহত। এক কথায় মুসলমানদেরকে তারা হয় আহাম্মক বা নির্বোধ আখ্যা দেয় নতুবা তাদের নাম রাখে উম্মাদ বা পাগল। এই দুই নামই তারা মুসলমানদের রেখেছিল কিন্তু দেখ এরপর সেই নির্বোধ এবং উম্মাদই পৃথিবীর বুদ্ধিমানদের শিক্ষক আখ্যায়িত হয়েছেন। অতএব আমাদের জামাত যতদিন পর্যন্ত সেই নির্বোধদের পন্থা অবলম্বন না করবে যাকে কাফির এবং মুনাফিকরা নির্বুদ্ধিতা প্রসূত কাজ আখ্যা দিত আর আমাদের জামাত যতদিন সেই উম্মাদদের রীতি অবলম্বন না করবে যাকে কাফির এবং মুনাফিকরা পাগলের আচরণ আখ্যা দিত ততদিন পর্যন্ত তারা সফলতা লাভ করবে না। যদি তোমরা প্রয়োজনে মিথ্যা বলতে চাও আর প্রয়োজনে ধোঁকা এবং প্রতারণার আশ্রয় নিতে চাও, যদি তোমরা প্রয়োজনে ধূর্ততার আশ্রয় নিতে চাও আর যদি তোমরা প্রয়োজনে পরচর্চা ও চুগলিকে কাজে লাগাতে চাও আবার আশা কর, তোমরা সফলতা লাভ করবে তাহলে স্মরণ রেখ, তোমরা আদৌ সেই সফলতা লাভ করতে পারবে না যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দিয়েছেন। এই বিষয়গুলো জাগতিক সংগঠনে নিঃসন্দেহে

কাজে আসে। ধোঁকা, প্রতারণা, পরচর্চা, চুগলি, কাউকে পদ থেকে অপসারনের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে এসব থাকলে কোন বরকত হয় না বরং খোদার অভিশাপ বর্ষিত হয়। তাই সকল উন্নত চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি, এগুলো ধর্মীয় জামাতে হওয়া আবশ্যক। তাই প্রত্যেক আহমদীর নিজেদের বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার মান অনেক উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে।

এরপর তালীমুল ইসলাম হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং প্রয়োজন বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একটি যুগ এমন ছিল, যখন তালীমুল ইসলাম কলেজের সূচনা হয় তখন চিন্তা ছিল, তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের এত লক্ষ রূপি প্রয়োজন এবং বার্ষিক এত টাকা আয় হওয়া আবশ্যক যেন কলেজ চালু রাখা যায় আর লক্ষ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা প্রণীত হচ্ছিল। অতএব সেই সময়ের উল্লেখ করে তিনি বলেন, একটি যুগ এমন ছিল যখন আমাদের জন্য উপরের ক্লাশগুলো চালু করাও কঠিন ছিল। এখানে অর্থাৎ কাদিয়ানে আর্যদের মাধ্যমিক স্কুল ছিল। প্রথম দিকে আমাদের ছেলেরা তাতে যোগ দেয়া আরম্ভ করে। তখন আর্য বা আরীয়া শিক্ষকরা তাদের সামনে লেকচার দেয়া শুরু করে যে, তোমাদের মাংস খাওয়া উচিত নয়। হিন্দুরা মাংস খায় না। মাংস খাওয়া অন্যায়। তারা এমন অনেক আপত্তি করত যা ইসলামের ওপর আক্রমনের নামান্তর ছিল। ছেলেরা স্কুল থেকে এসে এসব আপত্তি শোনাত। তিনি (রা.) বলেন, কাদিয়ানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল আর তাতেও অধিকাংশ শিক্ষক ছিল আর্য বা আরিয়া। আর এ কথাগুলোই তারা শিখাত। প্রথম দিন যখন আমি এই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে যাই, অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজের এই ঘটনা বর্ণনা করছেন, যখন আমি সেই সরকারী প্রাইমারী স্কুলে পড়তে যাই এবং দুপুরে আমার খাবার আসে তখন আমি স্কুল থেকে বের হয়ে পার্শ্ববর্তী একটি গাছের নীচে খাবার খেতে বসলাম। আমার খুব ভালভাবে মনে আছে, সেই দিন কলিজা রান্না করা হয়েছিল আর তা-ই আমার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তখন মিঞাঁ ওমর দ্বীন সাহেব মরহুম যিনি মিঞাঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের পিতা ছিলেন তিনিও একই স্কুলে পড়তেন। কিন্তু তিনি ওপরের ক্লাসে ছিলেন আর আমি ছিলাম প্রথম শ্রেণীতে। আমি খাবার খেতে বসলে তিনিও সেখানে উপস্থিত হন আর দেখে বলেন, আচ্ছা মাস খাচ্ছ। অথচ তিনি ছিলেন মুসলমান। এর কারণ ছিল, আর্য শিক্ষকরা শিখাত যে, মাংস খাওয়া অন্যায় এবং খুব ঘৃণ্য একটি কাজ। মাছ শব্দটি আমি প্রথমবার তার কাছে শুনেছি। তাই বুঝতে পারিনি, মাছ বলতে মাংস বুঝায়। আমি বললাম, এটি তো মাছ নয় বরং কলিজা। তিনি বলেন, মাংসকেই মাছ বলা হয়। অতএব মাছ শব্দটি আমি প্রথমবার তার মুখে শুনেছি আর এমনভাবে শুনেছি যেন মাছ খাওয়া মন্দ কাজ আর তা এড়িয়ে চলা উচিত। এক কথায় আর্য বা আরিয়া শিক্ষকরা এমন আপত্তি করত আর ছেলেরা ঘরে এসে বলত, এরা এইসব আপত্তি করে। অবশেষে এই বিষয়টি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কর্ণগোচর হলে তিনি বলেন, যে ভাবেই হোক না কেন জামাতকে কুরবানী করে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত। অতএব প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় আর ধরে নেয়া হয়, আমাদের জামাত পরম লক্ষ্য অর্জন করেছে। ইতোমধ্যে আমাদের ভগ্নিপতি নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব মরহুম মগফুর হিজরত করে কাদিয়ান চলে আসেন। তার স্কুল প্রতিষ্ঠার গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি মালির

কোটলায়ও একটি স্কুল চালাতেন। তিনি বলেন, আমি এই স্কুলকে অর্থাৎ কাদিয়ানের স্কুলকে মাধ্যমিকে উন্নীত করতে চাই। আমি মালিরকোটলার স্কুল বন্ধ করে দিব আর সেই সাহায্য এখানে দিয়ে দিব। অতএব কাদিয়ানে মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর কিছুটা নবাব মোহাম্মদ আলী সাহেব এবং কিছুটা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর আগ্রহের কারণে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, এখানে হাই স্কুল খোলা উচিত। তাই এরপর এখানে হাইস্কুল আরম্ভ হয়। কিন্তু এই হাইস্কুল প্রথমে নামে মাত্র ছিল। কেননা অধিকাংশ শিক্ষক ছিল মেট্রিক পাশ। আর অনেকে হয়তোবা মেট্রিক ফেলও ছিল। কিন্তু যাহোক হাইস্কুলের নাম প্রতিষ্ঠিত হয়। বেশি খরচ করার মত সাধ্য জামাতের ছিল না আর এমন কথা ভাবাও সম্ভব ছিল না। কিন্তু এরপর এমন সময়ও আসে যখন সরকার এই কথার ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়া আরম্ভ করে যে, স্কুল এবং বোর্ডিং নির্মাণ করা হোক। অধিকন্তু যারা স্কুল এবং বোর্ডিং নির্মাণ করবে তাদেরকে সাহায্য দেয়া হবে। অতএব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র খিলাফতকালে এই স্কুলও নির্মিত হয় আর বোর্ডিংও। এরপর ধীরে ধীরে স্টাফে পরিবর্তন আসতে থাকে এবং ছাত্রের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। প্রথমে দেড়শত ছিল, এরপর তিন চারশত হয়, এরপর সাত আটশত হয়ে যায় এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত ছাত্র সংখ্যা এটিই ছিল। গত তিন চার বছর যাবত স্কুলের ছাত্রদের এই সংখ্যা আটশ থেকে এক লাফে সতেরশ হয়ে গেছে। আর আমি শুনেছি, হাজারের ঊর্ধ্বে মেয়ে রয়েছে। এক কথায় ছেলে-মেয়ের সংখ্যা সম্মিলিতভাবে তিন হাজার দাঁড়ায়। এরপর মাদ্রাসা আহমদীয়া এবং কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মাদ্রাসা আহমদীয়াতেও আমার বিগত তাহরীকের অধীনে ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং প্রত্যেক বছর পঁচিশ থেকে ত্রিশজন ছাত্র আসা অব্যাহত আছে। উন্নতির এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে মাদ্রাসা আহমদীয়া এবং কলেজের ছাত্র সংখ্যা ছয় সাতশ পর্যন্ত বা তদুর্ধ্ব হয়ে যাবে। আর এভাবে প্রত্যেক বছর একশত মুবাল্লিগ আমাদের হাতে আসবে।

যতদিন প্রত্যেক বছর এই সংখ্যায় মুবাল্লিগ আমাদের হাতে না আসবে ততদিন পৃথিবীতে সঠিকভাবে কাজ করা আমাদের জন্য সম্ভব হবে না। অর্থাৎ এটি ছিল ন্যূনতম। এখন তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় শত শত মুবাল্লিগ পাশ করছে। ১৯৪৪ সনে আমি কলেজের ভিত্তি প্রস্তর রেখেছিলাম কেননা, তখন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব বা বাগডোর আমাদের হাতে নেয়ার সময় হয়ে এসে গিয়েছিল। একটি যুগ এমন ছিল যখন আমাদের জামাতের অধিকাংশ সদস্য ছিল স্বল্প আয়ের। এর মাধ্যমে জামাতের ইতিহাসও সুস্পষ্ট হয়। নিঃসন্দেহে কলেজের কিছু মানুষও আহমদীয়াত গ্রহণ করে জামাতভুক্ত হয়েছে কিন্তু সেটিকে দৈবঘটনা মনে করা হত। নতুবা উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন এবং ভালো আয়ের মানুষ আমাদের জামাতে গুটিকতক ছাড়া খুব বেশি ছিল না। একজন ব্যবসায়ী ছিলেন শেঠ আব্দুর রহমান হাজী আল্লাহ্ রাখ্খা সাহেব মাদ্রাসী, কিন্তু তার ব্যবসাও নষ্ট হয়ে যায়। তারপর শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব ছিলেন। এছাড়া আমাদের জামাতে আর কোন বড় ব্যবসায়ী ছিল না। আর কোন বড় ওহ্দাদার বা পদাধিকারীও জামাতভুক্ত ছিল না। এমনকি একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আমাকে বলেন, দেখ মিঞাঁ! কুরআন এবং হাদীস থেকে বুঝা যায়, নবীদের ওপর প্রথম দিকে বড় বড় লোকেরা ঈমান আনে না।

অতএব এটিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার একটি প্রমাণ যে, আমাদের জামাতে কোন বড় লোক যোগ দেয়নি, তাই কোন ইএসি আমাদের জামাতে নেই। সেই যুগের নিরিখে ইএসি অনেক বড় মানুষ হিসেবে গণ্য হতো, ইএসি বলতে সরকারী চাকুরে বুঝায় যাদেরকে হয়তো বা এসিস্টেন্ট কমিশনারও বলা হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলছেন, কিন্তু দেখ এখন ইএসি এখানে অলিতে গলিতে বিচরণ করে আর তাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। কিন্তু এক সময় আমাদের জামাতে উচ্চশ্রেণীর লোকের আমাদের জামাতে এত অভাব ছিল, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আমাদের জামাতে কোন বড় মানুষ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অর্থাৎ কোন ইএসি আমাদের জামাতে প্রবেশ করেনি। সেই সময়ের নিরিখে এক কথায় আমাদের জামাত একজন ইএসি-কেও সামলানোর সামর্থ্য রাখতো না।

আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সারা বিশ্বে জামাতের শত-শত স্কুল এবং কলেজ চালু আছে এবং আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বড় বড় বিশেষজ্ঞ এবং কর্মকর্তারা জামাতভুক্ত রয়েছে। বিভিন্ন দেশের দেশীয় সাংসদরা আহমদী আর তারা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায়ও সমৃদ্ধ। এমন নয় যে, তাদের মাঝে শুধু বস্তুবাদীতাই ছেয়ে আছে বরং আফ্রিকার কোন কোন দেশে আহমদীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপারাজির মধ্য থেকে এটিও একটি কৃপা যে, আল্লাহ্ তা'লা এভাবে উন্নতি দান করছেন! প্রারম্ভিক আহমদীদের ওপর কঠোরতা এবং খোদা তা'লার কৃপাবারির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, এক যুগ এমন ছিল যখন জামাত চতুর্দিক থেকে কঠোরতার সম্মুখীন ছিল। খুবই প্রারম্ভিক যুগের কথা এটি। মৌলভীরা ফতওয়া দিয়েছিলো, আহমদীদের হত্যা করা, তাদের ঘরে লুটপাট করা, তাদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয়া, তাদের মহিলাদের তালাক ছাড়াই অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেয়া শুধু বৈধই নয় বরং পুণ্যের কারণ। এই অবস্থা আজও বিরাজমান। কিন্তু সেই যুগে অধিকাংশ আহমদী অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। তাদের সাথে অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করা হতো। মৌলভীদের এই আচরণ সব সময় ছিল এবং আজও রয়েছে। যাহোক, সেই যুগে চরম কঠিন অবস্থা বিরাজমান ছিল কেননা আহমদীদের সংখ্যা ছিল কম। তিনি (রা.) বলেন, আর দুস্কৃতকারী এবং পাপাচারীরা যেহেতু নিজেদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য অজুহাত তালাশ করে থাকে তাই তারা এই ফতওয়ার বাস্তবায়ন আরম্ভ করে অর্থাৎ বিয়ে না করেই মহিলাদের নিজেদের জন্য বৈধ জ্ঞান করে নেয়। অর্থাৎ আহমদীদের কাছ থেকে তালাক নিয়ে নিজেরাই বিয়ে করে ফেলে। তিনি (রা.) বলেন, আহমদীদের ঘর থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছিল এবং চাকুরী থেকে বহিস্কার করা হচ্ছিল। তাদের সম্পত্তি জবর-দখল করা হচ্ছিল। অনেকেই এই সংকট হতে মুক্তির কোন উপায় না দেখে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন। আর হিজরতের জায়গা যেহেতু তাদের জন্য কাদিয়ানই ছিল তাই তাদের কাদিয়ান আসার কারণে আতিথেয়তার ব্যয় আরও বেড়ে যায়। তখন জামাতের সদস্য সংখ্যা এক দুই হাজার পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিল কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই শত্রুর আক্রমনের লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছিল। জামাতের সদস্য সংখ্যা দুই এক হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই শত্রুর আক্রমনের লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছিল। এক দুই হাজার মানুষ যারা সব সময়

নিজেদের প্রাণ, নিজেদের সম্মান, নিজেদের সম্পত্তি এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও নিরাপত্তা নিয়ে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত আর দিবারাত্র মানুষের সাথে ঝগড়া এবং বিতর্কে লিপ্ত, তাদের পক্ষে সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রচারের জন্য অর্থের যোগান দেয়া এবং ধর্ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে যারা কাদিয়ান আসে তাদের আতিথেয়তার ভার বহন করা এবং একইসাথে নিজেদের নির্যাতিত মুহাজির ভাইদের ব্যয়ভার বহন করা এক আশ্চর্যজনক বিষয়। এই ইতিহাসও আমাদের সবার জানা থাকা উচিত, এগুলো কোন সামান্য বিষয় নয়। শত শত মানুষ উভয় বেলা জামাতের দস্তরখানে খাবার খেত। আর কোন কোন গরীব আহমদীর অন্যান্য চাহিদা পূরণের ব্যবস্থাও করতে হতো। হিজরত করে আগমনকারীদের সংখ্যাধিক্য এবং অতিথিদের সংখ্যাধিক্যের কারণে অতিথিশালা ছাড়াও কাদিয়ানের প্রতিটি ঘর মেহমানখানায় রূপ নিয়েছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘরের প্রতিটি কক্ষ এক একটি স্থায়ী ঘরে রূপ নিয়েছিল। অর্থাৎ প্রত্যেক কক্ষে এক একটি পরিবার বসবাস করছিল। প্রতিটি কামরা এক একটি পরিবারকে দেয়া হয়েছিল এবং একটি বাড়িতে পরিণত হয়েছিল যাতে কোন না কোন অতিথি বা হিজরতকারী পরিবার অবস্থান করছিল। এককথায় বোঝা মানবীয় শক্তি এবং সহ্যশক্তির বাইরে ছিল। প্রত্যেক প্রভাত নতুন পরীক্ষা এবং নতুন দায়িত্ব নিয়ে উদিত হতো এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যা নামত নিজের সাথে নতুন পরীক্ষা এবং নতুন দায়িত্ব নিয়ে আসত কিন্তু "আলায়সাল্লাহু বেকাফীন আবদাহু"-র মৃদু মন্দ বাতাস সমস্ত দুঃশ্চিন্তাকে খড়কুটার ন্যায় উড়িয়ে নিয়ে যেত। আর সেই মেঘমালা যা জামাতের প্রারম্ভিক ইমারতের ভিত্তিকে মূল থেকে উৎপাটনের হুমকি ধমকি দিত স্বল্প সময়ের ভেতর রহমত এবং কৃপারূপী মেঘে পরিণত হতো। আর তার একেকটি বিন্দু বর্ষিত হওয়ার সময় "আলায়সাল্লাহু বেকাফীন আবদাহু"-র শক্তি সঞ্চারী ধ্বনি সৃষ্টি হতো। অর্থাৎ এত কঠোরতা থাকা সত্ত্বেও এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য যথেষ্ঠ আর ইনশাল্লাহ্ অবস্থার পরিবর্তন হবে।

আজও যদিও বিশেষত পাকিস্তানে এবং অন্য কিছু দেশের মুসলমানদের মাঝে কিছু উগ্রতা এবং কঠোরতা রয়েছে। পাকিস্তানে বেশি এবং পৃথিবীর অন্য কিছু দেশেও আহমদীরা সংকীর্ণতার সম্মুখীন কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্যার উৎকণ্ঠা পূর্বের মত নয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আর্থিক দিক থেকেও জামাত উন্নত এবং অন্যান্য ব্যবস্থাও পূর্বের চেয়ে অনেক ভাল যা আল্লাহ্ তা'লার ফযল বা কৃপারাজী প্রকাশ করে চলেছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখন পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আহমদীয়াত পৌঁছে গেছে। এখন আহমদীরা হিজরত করে শুধু এক জায়গায় একত্রিত হয় না বরং সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে। প্রতিকূলতার কারণে তারা বেরিয়ে পড়েছে আর বাইরে আসার কারণে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আরও বর্ধিত স্বাচ্ছন্দ সৃষ্টি হচ্ছে। আর কিছু সমস্যা দেখা দিলেও "আলায়সাল্লাহু বেকাফীন আবদাহু"-র ধ্বনি আজও আমাদের সাপোর্ট বা সহায়ক হিসেবে দন্ডায়মান হয়। আজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লঙ্গর বা অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা কখনও আমাদেরকে পরিত্যাগ করেন নি আর ইনশাল্লাহ্ তা'লা করবেনও না যদি আমরা তাঁর আঁচলকে আঁকড়ে ধরে রাখি। নিঃসন্দেহে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে আর আহমদীরা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ত্যাগ স্বীকার করে থাকে বা কুরবানী দিয়ে

থাকে কিন্তু প্রতিটি কুরবানী খোদার কৃপাবারি সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের এক নতুন রাস্তা প্রদর্শন করে। আল্লাহ্ তা'লা দেয়ার ক্ষেত্রে কখনও কার্পণ্য করেন না।

এরপর ঐশী হিফাযতের নিদর্শন সংক্রান্ত একটি ঘটনা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনী থেকে ঐশী হিফাযতের একটি দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করছি। ক্বমর সীন সাহেব যিনি লাহোর ল কলেজের প্রিন্সিপাল, তার পিতার সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সুগভীর সম্পর্ক ছিল। এমনকি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন সময় অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলে অনেক সময় তার কাছ থেকে ঋণও নিতেন। এই ক্বমর সীন সাহেব হিন্দু ছিলেন। তিনিও হযরত সাহেবের জন্য গভীর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা রাখতেন।

জিহলম এর মামলার প্রেক্ষাপটে তিনি তার ছেলেকে টেলিগ্রাম করেছিলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে তিনি যেন উকিলের দায়িত্ব পালন করেন। এই আন্তরিকতার কারণ ছিল, তিনি যৌবনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বেশ কয়েকটি নিদর্শন দেখেছেন যখন তিনি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং আরও কয়েকজন বন্ধু শিয়ালকোটে একত্রে বসবাস করতেন। সেসব নিদর্শনের একটি হলো, এক রাতে তিনি (আ.) বন্ধুদের সাথে ঘুমাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চোখ খুলে যায়। তাঁর হৃদয়ে এই ধারণা সঞ্চার করা হয়, এই ঘর নিরাপদ নয়। এটি আশঙ্কার মাঝে রয়েছে। তিনি (আ.) সবাইকে জাগ্রত করেন এবং বলেন, ঘর আশঙ্কার মাঝে রয়েছে, সবার এ থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। ঘুমের আধিক্যের কারণে কেউ ভ্রুক্ষেপ করেনি আর একথা বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ে যে, এটি আপনার সন্দেহমাত্র। কিন্তু তাঁর দুঃশ্চিন্তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে তিনি আবার তাদেরকে জাগ্রত করেন এবং এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন, ছাদ থেকে কড়কড় আওয়াজ আসছে। ঘর খালি করে দেওয়া উচিত। তারা বলে, এটি সামান্য ব্যাপার। অনেক সময় কাঠে পোকা ধরলে এমন আওয়াজ হয়েই থাকে। আপনি আমাদের ঘুম কেন নষ্ট করছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুনরায় জোর দেন, আচ্ছা ঠিক আছে আমার খাতিরেই বেরিয়ে পড়ুন। অবশেষে বাধ্য হয়ে তারা বের হতে সম্মত হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যেহেতু দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ্ তা'লা আমার নিরাপত্তার জন্যই ঘরকে ধ্বসে পড়া থেকে বাঁধা দিয়ে রেখেছেন তাই তিনি তাদেরকে বলেন, প্রথমে আপনারা বের হন পরে আমি বের হব। তারা যখন বেরিয়ে যায় এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বের হন। তিনি (আ.) সিঁড়িতে এক পা রাখতেই ছাদ ধ্বসে পড়ে। দেখুন! তিনি (আ.) কোন প্রকৌশলী ছিলেন না যে, ছাদের অবস্থা দেখেই বুঝতে পারতেন, এটি ধ্বসে পড়তে উদ্বত। এছাড়া যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি জোর করে মানুষকে উঠাতে থাকেন ততক্ষণ ছাদ নিজের জায়গাতেই ছিল আর যতক্ষণ তিনি বের হননি তখন ছাদও ধ্বসে নি কিন্তু যখনই তিনি পা উঠিয়েছেন ছাদ ভূমিতে ধ্বসে পড়ে। এ বিষয়টি প্রমাণ করে, এটি কোন দৈব বিষয় ছিল না বরং সেই ঘরকে হিফাযতকারী সত্তা ততক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখেন যতক্ষণ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেই ঘর থেকে বের হননি যার হিফাযত বা নিরাপত্তা সেই হাফিয সত্তার দৃষ্টিতে ছিল। তাই

হাফিয বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব এক ইচ্ছা-শক্তি সম্পন্ন সত্তার স্বাক্ষ্য বহন করে এবং তাঁর অস্তিত্বের এক জীবন্ত স্বাক্ষী।

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারের আরো একটি ঘটনা তিনি (রা.) বর্ণনা করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, একবার আমি অমৃতশহর থেকে টমটম গাড়িতে করে যাত্রা করি। অনেক মোটা তাজা এক হিন্দুও আমার সাথে সেই এক্কা গাড়ি বা টমটম গাড়িতে চেপে বসে। সে আমার পূর্বেই এক্কা বা টমটম গাড়িতে বসে পড়ে এবং আরামের জন্য নিজের পা ছড়িয়ে বসে এমনকি দ্বিতীয় সিট যেখানে আমার বসার জায়গা ছিল তার পথেও বাঁধ সাধে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তাই আমি অল্প একটু জায়গায় বড় কষ্টে আসন গ্রহণ করি। সেই দিনগুলোতে বড় কড়া রোদ উঠতো যার ফলে মানুষের চেতনা হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো। আমাকে রোদ থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ব্যবস্থার অধীনে, এক খন্ড মেঘমালা পাঠিয়েছেন যা আমাদের টমটম গাড়ির ওপর ছায়া দিতে দিতে বাটালা পর্যন্ত আসে। এই দৃশ্য দেখে সেই হিন্দু বলে, আপনাকে তো খোদা তা'লার অনেক বড় বুযূর্গ বলে মনে হয়।

অতএব খোদা তা'লা স্বীয় বান্দাদের সাথে এমন ব্যবহার করেন যে, মানুষ বিস্মিত হয়ে যায় কিন্তু শর্ত হলো সত্যিকার বান্দা হওয়া। আর এমন মানুষের পরিণাম অবশ্যই শুভ হবে। বাহ্যত পৃথিবীর বাহ্যিকতার পূজারীদের দৃষ্টিতে তাকে লাঞ্ছিত মনে হবে কিন্তু পরিণতিতে সে অবশ্যই সম্মান লাভ করবে। বাহ্যত সে দুর্নামেরও ভাগী হবে কিন্তু পরিণতিতে সে সুনাম লাভ করবে। এক কথায় তার সূচনা হবে প্রকৃত বান্দা হিসেবে আর সমাপ্তি ঘটবে খোদার সাহায্যের মাধ্যমে। অর্থাৎ প্রকৃত বান্দা হিসেবে যদি খোদার ইবাদত করা হয়, তাঁর বান্দা হওয়া যায় তবে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য মানুষের সাথী হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক অনিষ্টের মোকাবিলায় তার সাহায্য করে থাকেন।

নেক প্রভাব সৃষ্টি এবং পুণ্য বন্টন আর নিজ ভক্তদের সংশোধন এবং মানবতার জন্য হৃদয়ে বেদনা লালনের ক্ষেত্রে একজন সাধারণ পীর এবং একজন খোদা প্রেরিত ব্যক্তির মাঝে যে কী পার্থক্য থেকে থাকে এর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, লুধিয়ানার মুন্সী আহমদ জান সাহেবের কথা বলতে গিয়ে তিনি একথা লিখেছেন যে, লুধিয়ানার মুন্সী আহমদ জান সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি এত প্রখর ছিল যে, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তাঁর দাবীর পূর্বেই লিখেছেন, **"আমরা যুগের রোগাক্রান্তরা তোমারই পথ পানে চেয়ে আছি। তুমি আল্লাহ্‌র খাতিরে আমাদের চিকিৎসা কর"**। মুন্সী আহমদ জান সাহেব তার সন্তানদের নসীহত করেছেন, আমি মারা যাচ্ছি কিন্তু তোমরা একথা ভালভাবে স্মরণ রাখবে, মির্যা সাহেব অবশ্যই একটি দাবী করবেন। আর তোমাদের জন্য আমার তাকিদপূর্ণ নির্দেশ হলো, তোমরা মির্যা সাহেবকে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ তিনি এমন পর্যায়ের পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। তিনি যৌবনে নিজ পীরের সেবার জন্য বারো বছর পর্যন্ত সেই চাক্কি চালিয়েছেন যাতে সাধারণত ষাঁড় যোতা হয়। বারো বছর পর্যন্ত তিনি এভাবে

আটা পিষতে থাকেন। এরপর তিনি তাকে আধ্যাত্মিকতার পাঠ দিয়েছেন। অর্থাৎ বারো বছর পর্যন্ত ষাঁড়ের মতো আটা পিশার পর পীর সাহেব তাকে আধ্যাত্মিকতার কিছু পাঠ দান করেছেন। খলীফা সানী বলছেন, যারা সেই যুগে পীর আখ্যায়িত হতো, রূহানী বা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আখ্যায়িত হতো তারাও মানুষকে আধ্যাত্মিক কথা বলার ক্ষেত্রে মারাত্মক কার্পণ্য প্রদর্শন করত। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কেবল জগতকে সেসব কিছুই অবহিত করেন নি বরং তা থেকে সহস্র-সহস্র গুণ বেশি এমন আরো অনেক কথা পৃথিবীবাসীকে জানিয়েছেন যা সম্পর্কে পৃথিবী পূর্বে অবগত ছিল না। আর এভাবে জ্ঞানকে তিনি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন কিন্তু হাদীসে দেয়া সংবাদ অনুসারে, পৃথিবী এর মূল্যায়ন করেনি।

অতএব বাহ্যিক দৃষ্টিতে যারা রূহানী বা পীর তারা সে ব্যক্তির সামনে দাঁড়াতেই পারে না, যাকে আল্লাহ্ তা'লা বিশেষভাবে, পৃথিবীর সংশোধনের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করেছেন পৃথিবীর মানুষের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি করার জন্য এবং তাদেরকে খোদার নিকটতর করার জন্য। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং বলেছেন, যে কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন তাহলো, আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের সম্পর্কের মাঝে যেই পঙ্কিলতা এবং বিপত্তি দেখা দিয়েছে তা দূরীভূত করে ভালবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ককে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

তিনি (আ.) আরো বলেন, যেন ধর্মীয় সত্যতা যা পৃথিবীর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে তাকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেই। আর সেই আধ্যাত্মিকতা যা প্রবৃত্তির অমানিশায় চাপা পড়েছে তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করি। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, সেই খাঁটি এবং উজ্জ্বল একত্ববাদ যা সকল প্রকার শিরকের মিশ্রণ থেকে মুক্ত, যা এখন হারিয়ে গিয়েছে, জাতির মাঝে যেন পুনরায় এর চারা রোপন করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন বয়আতের সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী হতে পারি। ধর্মীয় সত্যকে চিনে তা যেন মেনে চলতে পারি। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারি। আর তৌহিদের প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য থেকে আমরা যেন অংশ পাই।

আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর মানুষকেও এই দূরদৃষ্টি দান করুন। আর বিশেষ করে উম্মতে মুসলেমাহ্কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদী (আ.)-এর হৃদয়ের ব্যাথা- বেদনা অনুধাবন করে তাঁর হাতে বয়আত করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি দু'জনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। একটি জানাযা হলো, করাচীর জনাব চৌধুরী মকসুদ আহমদ সাহেবের পুত্র জনাব নোমান আহমদ আঞ্জুম সাহেবের যিনি মালির এর রেফায়ে আম সোসাইটিতে বসবাস করতেন। জনাব নোমান আহমদ আঞ্জুম সাহেবকে করাচীতে আহমদীয়াতের বিরোধীরা ২০১৫ সনের ২১শে মার্চ সন্ধ্যা প্রায় পৌনে আটটার দিকে তার দোকানে এসে গুলি করে শহীদ করে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। সেদিন সন্ধ্যা পৌনে আটটার সময় শহীদ মরহুম তার স্টোর বা দোকানে ছিলেন। দু'জন সশস্ত্র ব্যক্তি স্টোরে এসে গুলি করে। একটি বুলেট বুকে লাগে এবং হৃদপিন্ড স্পর্শ করে পিঠের দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। পার্শ্ববর্তী দোকানদারগণ তার ভাই জনাব ওসমান আহমদ সাহেবকে ফোন করে অবহিত করে এবং উদ্ধার

কর্মীদেরও অবহিত করে। তাৎক্ষণিকভাবে তারা দোকানে আসে। নোমান সাহেবকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কিন্তু পথিমধ্যে তিনি শাহাদাত বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

শহীদ মরহুমের বংশে আহমদীয়াত এসেছিল তার দাদা জনাব চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ সাহেবের মাধ্যমে যিনি মোকাররম চৌধুরী করীম উদ্দীন সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে বয়আত করেছিলেন। চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ সাহেবের পিতা-মাতা তার বয়স অল্প থাকতেই ইন্তেকাল করেন। পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ সাহেব কাদিয়ানে স্থানান্তরিত হন এবং বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাও কাদিয়ানেই অর্জন করেন। সেখানেই মোবারক আলী সাহেবের কন্যা সুফিয়া সাদেকা সাহেবার সাথে বিয়ে হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি সাহীওয়ালের হাডাপ্পায় স্থানান্তরিত হন। শহীদ মরহুমের পিতা জনাব মকসুদ আহমদ সাহেব রাবওয়াতেই জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ তারা পরে সাহীওয়াল থেকে রাবওয়া স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। শহীদ মরহুমের দাদা চাকরীর সুবাদে ১৯৬৮ সাল থেকে স্বপরিবারে গুজরাঁওয়ালায় বসতি স্থাপন করেন। ১৯৭৪ সনে গুজরাঁওয়ালাতে যখন দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় তখন আহমদীয়া বাইতুয্ যিকর এর হিফাযত করতে গিয়ে শহীদ মরহুমের দাদা জনাব চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ সাহেব, চাচা জনাব মাহমুদ আহমদ সাহেব এবং ফুফা জনাব সাঈদ আহমদ সাহেবও শাহাদাত বরণ করেন। তার পূর্বে এ পরিবারে এই তিন শহীদ হয়েছেন। এই পরিস্থিতির কারণে এই পরিবারটি ১৯৭৬ সনে করাচী স্থানান্তরিত হয়। নোমান আহমদ আঞ্জুম সাহেব ১৯৮৫ সনের ২৬শে জানুয়ারীতে করাচীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এমবিএ পাশ করেছেন। এরপর ২০০৮ সনে তিনি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এর ব্যবসা আরম্ভ করেন। মরহুম আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মূসী ছিলেন। একান্ত ঈমানদার, নেক হৃদয়, সচ্চরিত্রের অধিকারী, মিশুক এবং ভদ্র মানুষ ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিত প্রাণ এক যুবক ছিলেন। কর্মচারীদেরকেও ছোট ভাইয়ের মতো দেখতেন। মিঠ্যিতে নগর পারকারে জামাতের ব্যবস্থাপনার অধীনে প্রতিষ্ঠিত কম্পিউটার ইন্সটিটিউট এবং মিশন হাউসের জন্য কিছু কম্পিউটার এবং কম্পিউটার-সংক্রান্ত জিনিস-পত্র তোহ্ফা হিসেবে পেশ করেন। সেখানে নিজেই সিস্টেম ইনস্টল করে দেন। শহীদ মরহুমের ইচ্ছা ছিল তার দাদা জনাব চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ সাহেব শহীদের নামে একটি কম্পিউটার ইন্সটিটিউট গড়ে তুলবেন যেন শহীদ দাদার নাম চিরস্থায়ী হয়। আর এই কারণে তিনি একসেসরিজ এবং কম্পিউটার ইত্যাদি মিঠ্যিতে কম্পিউটার ইন্সটিটিউটকে তোহফা হিসেবে দিয়েছেন। অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অ-আহমদীরাও বলত, তিনি এক ফিরিশতা। বর্তমানে রেফায়ে আম সোসাইটিতে মজলিসের কায়েদ হিসেবে জামাতের খিদমতের তৌফিক পাচ্ছিলেন। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতেন এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জামাতের কাজে অংশ নিতেন। বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে তাকে সবসময় হুমকী-ধামকী দেওয়া হতো কিন্তু তিনি তার ছোট ভাইদের সবসময় সাবধান থাকার নসীহত করতেন। ছয় মাস পূর্বে শহীদ মরহুম নিজের ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে আসছিলেন। তখন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা তাকে দাঁড় করিয়ে জিনিসপত্র

ছিনতাই করে নিয়ে যায় আর টাকা পয়সাও ছিনিয়ে নেয় এবং একই সাথে একথাও বলে, আমরা তোমাকে হত্যা করার জন্য এসেছিলাম কিন্তু যেহেতু টাকা পেয়ে গেছি তাই তোমাকে এখন ছেড়ে দিচ্ছি। শহীদ মরহুমের ছেড়ে যাওয়া পরিবার পরিজনের মাঝে পিতা জনাব চৌধুরী মকসুদ আহমদ সাহেব, মাতা সুফিয়া সাদেকা সাহেবা এবং দুই ভাই যীশান মাহমুদ ও ওসমান মাহমুদকে রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা শহীদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার তথা পিতা-মাতা ও ভাইদেরকে ধৈর্য্য এবং সহ্য শক্তি দান করুন।

জামাতের মুয়াল্লিম খুররম আহমদ সাহেব বলেছেন, শহীদ মরহুম অত্যন্ত নম্রভাষী, স্নেহশীল, জামাতের খিদমতের প্রেরণায় সমৃদ্ধ এক যুবক ছিলেন। অনেক পরিশ্রম এবং যত্নের সঙ্গে সেখানে কম্পিউটার ইনস্টল করেছেন যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে। বেশ কয়েকবার নগর পারকারে আসতেন। এটি সিন্ধুর এক প্রত্যন্ত অঞ্চল। বেশ কয়েকবার সেখানে যখন পৌঁছতেন তাকে বলা হতো, আপনি ক্লান্ত; প্রথমে বিশ্রাম নিন এরপর কাজ করবেন। কিন্তু তিনি সব সময় এ কথাই বলতেন, আমরা মুজাহিদ। শহুরে দেখে আমাদের সম্পর্কে এটি ভাববেন না যে, আমরা নাজুক মন-মানসিকতার অধিকারী। সব সময় খিদমতের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। সাবেক আঞ্চলিক কায়েদ মনসূর সাহেব বলেন, যখন তার বয়স বার বছর ছিল তখন থেকেই আমি তাকে চিনি, তিফল ছিলেন। সবসময় বড় উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জামাতী কাজে এবং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন। সবসময় পজিশন পেতেন। ইনি বলেন, সবসময় তিনি প্রথম হতেন এবং এর জন্যই চেষ্টা করতেন। কখনও দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন না। স্কুলের পর পিতার ব্যবসায় তাকে সাহায্য করতেন এবং একই সাথে জামাতী দায়িত্বও পালন করতেন। তিনি নিজের ঘর এবং ব্যক্তিগত কাজে ততটা সময় দিতেন না যতটা জামাতী কাজের জন্য সময় ব্যয় করতেন। অন্যান্য যুবকদের মতো তিনি কখনও নিজের সময় নষ্ট করেন নি। অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে কথা বলতেন। টমি কালু সাহেবেরও তিনি আত্মীয়; তিনি বলছেন, আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা অনেক চেষ্টা করেছে তিনি যেন পাকিস্তান থেকে বাইরে চলে যান। অনেক জোর দেয়া হয়েছে কিন্তু তিনি পাকিস্তান ছেড়ে আসতে রাজী ছিলেন না।

জামাতের মুরুব্বী ইমরান তাহের সাহেব বলেছেন, তিনি আমার আত্মীয়ও ছিলেন। বিশ বছরে একবারও তাকে কারও সাথে চিৎকার করে কথা বলতে বা রুক্ষস্বরে কথা বলতে দেখিনি। বিনয়, নম্রতা এবং দীনতার প্রতিচ্ছবি ছিলেন। অত্যন্ত ভদ্র ও স্নেহশীল এক মানুষ ছিলেন। কানাডায় তার এক আত্মীয়া খালাত বোন আছেন। তিনি বলেন, যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে, করাচীর পরিস্থিতির কারণে তাকে হিজরত করতে বলা হতো কিন্তু তিনি সবসময় সর্ব প্রকার পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে মায়ের সাথে পাকিস্তান থাকাই পছন্দ করেছেন। মায়ের প্রতিটি ইচ্ছা এবং চাহিদার প্রতি তিনি খেয়াল রাখতেন।

মশহুদ হাসান খালেদ সাহেব জামাতের মুরুব্বী, তিনি বলেছেন, একদিন খাকসার শহীদ মরহুমের সাথে বসে কথা বলছিলাম। শহীদ মরহুম বলেন, সেই সৌভাগ্যবান কারা যারা শহীদ

হয়ে থাকে। হয়তো তার এই বাসনার কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে এই মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা জনাব ইঞ্জিনিয়ার ফারুক আহমদ খান সাহেবের যিনি পেশাওয়ার জেলার নায়েব আমীর। ফারুক আহমদ খান সাহেব জনাব মাহমুদ আহমদ খান সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি শূরার পর রাবওয়া থেকে পেশওয়ার যাচ্ছিলেন। গাড়ির চাকা ফেটে যাওয়ার ফলে দুর্ঘটনায় পতিত হর। চকওয়ালে গাড়ি থেকে বাহিরে সড়কের ওপর ছিটকে পড়েন যার ফলে গুরুতর আঘাত পান। হাইওয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে তাকে চকওয়াল হাসপাতালে পৌঁছিয়েছে কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ।

ফারুক সাহেবের বংশে আহমদীয়াত আসে তার দাদা জনাব আহমদ গুল সাহেবের মাধ্যমে যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে তিনি লাহোরীদের সাথে যোগ দেন। পরবর্তীতে ফারুক খান সাহেব ১৯৮৯ সনে নিজে বয়আত করেন এবং আহমদীয়া জামাতভুক্ত হন। এরপর তার অন্য দুই ভাইও বয়আত করেন। ১৯৫৪ সনে তার জন্ম হয়। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়ালেখা করেন এবং পরবর্তীতে সরকারের মাইনিং ডিপার্টমেন্ট-এ চাকুরী করেছেন। ১৯৮৫ সনে এক আহমদী বংশে তার বিয়ে হয়। খুবই মিশুক, নেক প্রকৃতির এবং ভদ্র মানুষ ছিলেন। তিনি জামাতে আহমদীয়া পেশওয়ার এর সেক্রেটারী ইসলাহ্ ইরশাদ হিসেবেও কাজ করেছেন। মরহুম আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মূসী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত করুন এবং স্বীয় করুণার চাঁদরে তাকে আবৃত রাখুন। তার শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনকেও একইভাবে করুণাবারীতে সিক্ত রাখুন। তিনি স্ত্রী এবং ২৫ ও ১৭ বছর বয়স্ক দু'জন ছেলে এবং এক কন্যা শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্য হিসেবে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ধৈর্য্য এবং দৃঢ় মনোবল দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।